এক হাতি গণ্ডারের ছবি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক হাতি গন্ডারের ছবি

চার্চের ঠিক সামনে এক পাগল। সে হাঁকছিল, ‘দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্র। ওর হাতে লাঠি এবং লাঠিতে পাখির পালক বাঁধা। মাথায় লাল রুমাল। দূরে বেরন। হোটেলের পর্দা উড়ছে। পাগল চার্চের সদর দরজা থেকে বেরন হোটেলের দরজা পর্যন্ত ছুটে আসছিল বার বার আর ডিগবাজি খাচ্ছিল। সে কোনো যানবাহন। দেখছিল না, সে এক পাগলিনির জন্য যেন প্রতীক্ষা করছিল কারণ পাগলিনি অন্য পারে ঠিক পেচ্ছাবখানার পাশে এবং কিছুদূর হেঁটে গেলে অনেক কাপড়ের দোকান, ছায়া স্টোরস অথবা হরলালকা আর গ্রীষ্মের দিন বলে প্রখর উত্তাপে পাগলিনী নগ্ন এবং বধির, পাগলিনি পথের উপর বসে পড়ল।

ঠিক তখন চার্চের দরজার সামনে শববাহী শকট। সোনালি ঝালরের কাজ করা কালো কফিনে মৃত পুরুষ এবং কত ফুল। শোকের পোশাক পরা যুবক যুবতীরা, বৃদ্ধেরা সদর দরজা ধরে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সকাল হচ্ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। বড়ো বড়ো গাছের মাথায় সূর্য অকারণ কিরণ দিচ্ছে। তখন পাগল হাঁক দিয়ে সকলকে যেন ডেকে বলছিল, কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়। অথবা নানারকমের অশ্লীল আলাপ, যা শোনা যায় না, যার জন্য পথে হাঁটা দায়। তখন পথ ধরে কোটিপতি পুরুষের স্ত্রী দামি গাড়িতে নিউ মার্কেট যাচ্ছে। পথে দেবদারুগাছ এবং গাছের ছায়া পাগলিনির মুখে।

পাগল ঊর্ধবাহু হয়ে পাখির পালক ওড়াচ্ছে আকাশে। পাগলিনি বসেছিল, আর উঠছে না। এইসব দৃশ্য এ অঞ্চলে হামেশাই ঘটছে, পুলিশের প্রহরা এবং তীর্যক সব দৃষ্টির জন্য যানবাহন থেমে থাকছে না। বড় নোংরা এই অঞ্চল। দেয়ালে দেয়ালে বিচিত্র সব নগ্ন দৃশ্য চিত্রতারকাদের এবং রাজাবাজার পর্যন্ত অকারণ অশ্লীলতা। হামেশাই পথে ঘাটে নগ্ন যুবতীরা পাগলিনি প্রায় শুয়ে থাকছে। সব অসহ্য।

এবং মনে হয় এরা সকলে রাতে ফুটপাথে নিশিযাপন করেছিল। এখন এরা নিজেদের ছেড়া কাঁথার সঞ্চয় ছেড়ে রোজগারের জন্য বের হয়ে পড়বে। পাগল তার সঞ্চয় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল। কিছুই ফেলা যায় না। সে নারকেলের মালা এবং সিগারেটের বাক্স দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পয়েছিল। পিঠে পুরাতন জামার নীচে পচা ঘায়ের গন্ধ। সে শুধু এখন হাসছিল। পথে লোকের ভিড় বাড়ছে, ট্রাম বাসের ভিড় বাড়ছে। মানুষের মিছিল সারা দিনমান চলবে। পাগল হেসে হেসে সকলকে উদ্দেশ করে বলছিল, দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। সে এখন অন্য কোনো সংলাপ আর খুঁজে পাচ্ছিল না।

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ এবং ছায়াবিহীন এই পথ। ফুটপাথে অথবা গাড়ি বারান্দায় যারা রাত যাপন করছে, যারা ঠিকানাবিহীন, যাদের সব তৈজসপত্র ঘেঁড়া, নোংরা এবং প্রাচীনকাল থেকে সব সংরক্ষণ করছে নগরীর সেইসব প্রাচীন রক্ষীরা এখন অন্নের জন্য ফেরেববাজের মতো ঘোরাফেরা করছে। ছেঁড়া সব তৈজসপত্রের ভিতর এক অতিকায় বৃদ্ধ, মুখে দাড়ি শণপাটের মতো এবং সাদা মিহি চুল আর অবয়বে রবীন্দ্রনাথের মতো যে, কপালে হাত রেখে গ্রীষ্মের সূর্যকে দেখার চেষ্টা করছে।

অন্য ফুটপাথে পাগল ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আছে। ওর এই পাগলকে যেন কতকাল থেকে চেনা। বড়ো স্বার্থপর-বৃদ্ধ এই ইচ্ছাকৃত পাগলামির জন্য একদিন রাতে তখন নগরীর সকল মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন হাসপাতালের বড়ো আলোটা পর্যন্ত নিভে গিয়েছিল, রাজবাড়ির সদর বন্ধ হচ্ছে এবং যখন শেষ ট্রাম চলে গেল, যানবাহন বলতে পথে কোনো কপর্দক পড়ে নেই....সব নিঃশেষ, শুধু কুকুরের মাঝে মাঝে আর্ত চিৎকার তখন পাগল ওই পাগলিনির পাশে শুয়ে নোংরা তৈজসপত্রের ভিতর থেকে ছোটো ছোটো উচ্ছিষ্ট হাড় (আমজাদিয়া অথবা বেরন হোটেল থেকে সংগ্রহ করা) দুজনে চুষছিল, রাতের দ্বিপ্রহরে ওদের উদরে মাংসের রস যাচ্ছে, ওরা সারা দিনমান পাগলামির জন্য ফের প্রস্তুত হতে পারছে–বৃদ্ধ হাঁ করে দেখতে দেখতে বলেছিল, এই সরে বোস, এটা পাগলামির জায়গা নয়। ঘুমোতে দে। রাজ্যের সব নোংরা এনে জড় করেছিস?

পাগল কিছুক্ষণ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকল। কথাটা বোধগম্য হয়নি। কিন্তু পাগলিনি সুলভ রমণীর মতো কাছে এসে বলল, ‘তোর বাপের জায়গা! ঠিক ভালো মানুষের মতো, ঠিক সুলভ রমণীর মতো এবং দিনের জন্য অভিনয়টুকু তখন আর ধরা পড়ছে না, পাগলিনি গলাটা খাটো করে বলল, তোর মুখে চুনকালি পড়বে।

পাশে তেরো বছরের সুমি চিৎকার শুনে উঠে বসেছিল। রাতে পিতামহের হাত ধরে ফুটপাথের অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছিল। ওরা পাগলিনির ঝোলাঝুলির ভিতর পচা গন্ধ পাচ্ছিল কারণ এই ঝোলাঝুলি বরফ ঘরের মতো—সবই দুর্দিনের জন্য সংরক্ষণ করা

এবং কত রকমের সব উচ্ছিষ্ট খাবার। পাগলিনি চিৎ হয়ে শুয়েছিল। মাংসের হাড় অনবরত চোষার জন্য গালের দুধারে ঘায়ের মতো সাদা দাগ। শরীরে দীর্ঘদিনের ময়লার পলেস্তারা মুখের অবয়বকে নষ্ট করে দিয়েছে। চেনা যাচ্ছিল না ওরা জন্মসূত্রে কোনো গ্রাম্য গৃহস্থের ঔরসজাত না অন্য কোনোভাবে অথবা কোনো অলৌকিক ঘটনার নিমিত্ত এই ফুটপাথ সংলগ্ন ডাকবাক্সের মতো পাতলা অস্থায়ী প্লাইউডের বাড়িতে বসবাস করছে।

পাশের বাড়িটা চারতলা এবং নীচে ফুটপাতের উপর ছাদের মতো গাড়িবারান্দা। সামনে হাসপাতাল এবং রাজবাড়ি, সদর দরজার উপর একটা এক হাত লম্বা গণ্ডারের ছবি ঝুলছে। সময়ে অসময়ে বৃদ্ধ ছবিটার নীচে কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে পড়ার সময় ‘নাট্যকার এই শব্দটি ভয়ংকরভাবে কষ্ট দিতে থাকে। আর হাসপাতালের বাড়িটা দীর্ঘদিন খালি পড়েছিল, শুধু কাক উড়ত ছাদে এবং পাঁচিলের পাশের পেয়ারা গাছটাতে একজোড়া ঘুঘু পাখি আশ্রয় নিয়েছিল। ইদানীং চনকাম হবার সময় মোষের মতো এক ইতর ছোকরা কিছু চুনগোলা জল ছাদ থেকে নালির ফুটোর উপর ফেলে দিয়েছিল। সেই মোষটা হালফিলে সকল খবর নিয়ে গেছে এবং চেটেপুটে রেখে গেছে সুমিকে। চুনগোলা জলের জন্য ঘুঘু পাখিরা উড়ে চলে গেল। তারপর একদিন যেন মনে হল ফের এম্বুলেন্স আসতে শুরু করেছে, ফের এই বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল এবং ট্রাম ডিপোতে ফের ঘন্টি বাজছে।

আর এই বাড়িটার জন্যই ভোরের দিকে সূর্যের উত্তাপ ছাদের নীচে যেন পৌঁছাতে পারে না অথবা লম্বা হয়ে যখন সর্য হাসপাতালের মত মানষের ঘর অতিক্রম করে পেয়ারাগাছের মাথায় এসে পৌঁছোয় তখন ছাদের ছায়া বৃদ্ধ ফকিরচাঁদকে রক্ষা করতে থাকে। এই জন্যই অভ্যাসের মতো এই স্থান বসবাসের উপযোগী। সুমি পাশে নেই, কোথাও আহারের জন্য অন্নসংস্থান করতে গেছে। সে নিজে একটা শতচ্ছিন্ন চাদর ফুটপাথে বিছিয়ে তার পাশে কিছু গোটা অক্ষরে, তার জীবনের বিগত ইতিহাস, পরাজিত সৈনিকের মতো মাথা হেঁট করে ধিকৃত জীবন এবং গ্লানিকর জীবনের জন্য করুণা ভিক্ষা করছিল।

গ্রীষ্মের উত্তাপ প্রচণ্ড। দীর্ঘদিন থেকে অনাবৃষ্টি। সব কিছু রোদের উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে। পথের গলা পিচে করপোরেশনের গাড়ি বালি ছিটিয়ে গেছে। তখন পাগল পিচগলা পথে, মাথায় দুপুরের রোদ, লাঠিতে পাখির পালক বাঁধা—হাঁটছে। ইতস্তত সব ডাস্টবিনের জংশন এবং সেখানে হয়তো সুমি পোড়া কয়লা, কাগজ অথবা লোহার টুকরো খুঁজছে। ফকিরচাঁদ উঠে এক মগ চা সংগ্রহ করল। রাতের আহারের জন্য খড়কুটো অথবা পাতলা কাঠ সংগ্রহ করতে হয়-ফকিরচাঁদ আকাশ দেখল, আকাশ থেকে গনগনে আঁচ ঝরে পড়ছে, সে এই রোদে বের হতে সাহস করল না। সে হাত বাড়াল রোদে—যথার্থই হাত পুড়ে যাচ্ছে যেন, শুধু রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে এক হাত গণ্ডারের ছবিটা এই রোদে চিক চিক করছিল।

বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ এবার পা দিয়ে নিজের সুন্দর হস্তাক্ষর মুছে দিল। পাঁচিল সংলগ্ন ওর ছোটো প্লাইউডের সংসার—বসবাসের উপযোগী নয়, শুধু তৈজসপত্র রাখার জন্য পাতলা প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে সব ঢাকা। ফকিরচাঁদ সব টেনে বের করল মেটে হাঁড়ি পাতিল, ছেড়া কাঁথা, ভাঙা জলের কুঁজো সবই সুমির সংগ্রহ করা, মেয়েটার সারাদিন ঘুরে ঘুরে ওই এক সংগ্রহের বাতিক এবং সুমিই একদা শেয়ালদা স্টেশন থেকে এই বাড়ি সংলগ্ন গাড়িবারান্দা আবিষ্কার করে ফকিরচাঁদের হাত ধরে চলে এসেছিল। সেই থেকে অবস্থান এবং সেই থেকে দিনগত পাপক্ষয়। সে এ-সময় ভালো করে চারদিকটা দেখল। মগের চা কিছু খেয়ে কিছু রেখে দিল, পাশে পাগল পাগলিনির আস্তানা। দুজনই সারাপথে অভিনয়ের জন্য বের হয়ে গেছে। দুজনই হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার রাতের জন্য সংগ্রহ করছে।

প্রখর উত্তাপের জন্য পথ জনবিরল। দোতলায় মসজিদ এবং সেখানে মোল্লার আজান। ফকিরচাঁদ এবার চিৎকার করে ডাকল—সু.....উ.......মি। ফকিরচাঁদ কপালে হাত রেখে দেখল ট্রামডিপোর সামনে ডাস্টবিন এবং সেখানে সুমি উপুড় হয়ে কী খুঁছছে। সে কোথাও আজ বের হল না ভিক্ষার জন্য, ফকিরচাঁদ মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্ষোভে দুঃখে ফের বড়ো বড়ো সুন্দর হস্তাক্ষরে ফকিরচাঁদ ফুটপাথ ভরিয়ে তুলল। সামনের বড়ো বড়ো বাড়িগুলোর দরজা জানালা বন্ধ। ট্রাম ফাঁকা এবং বাসযাত্রী উত্তাপের জন্য কম। সে সুন্দর হস্তাক্ষরের উপর থুথু ফেলল তারপর রাগে দুঃখে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সুমি আসছে না, ওর গলার আওয়াজ প্রখর নয়, সুতরাং সুমি ফকিরচাঁদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। ফকিরচাঁদ নিজেকে বড়ো অসহায় ভাবল—এই দুর্দিনে সে যেন আরও স্থবির হয়ে

যাচ্ছে, চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলছে, ক্রমশ জীবন থেকে সোনার আপেলের স্বপ্ন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এত বেলা হল, এখনো পেট নিরন্ন, সামনের হোটেলটাতে এখন গিয়ে দাঁড়ালে সমি নিশ্চয়ই কিছ পেত, কারণ শেষ খদ্দের ওদের চলে যাচ্ছে। ফকিরচাঁদ অভিমানে নিজেই উঠে যাবার জন্য দাঁড়াতে গিয়ে প্রথম পড়ে গেল, পরে হেঁটে হেঁটে রেস্তোরাঁর সামনে যখন উপাসনার ভঙ্গিতে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল, যখন করুণাই একমাত্র জীবনধারণের সম্বল এবং আর কিছু করণীয় নেই এই ভাব—তখন সে দেখল সব সোনা রুপোর পাহাড় আকাশে। আকাশ গুড়গুড় করে উঠল, মেঘে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আর বাতাস পড়ে গেল, দরজা জানালা খুলে গেল এবং বৃষ্টির জন্য সর্বত্র কোলাহল উঠছে।

আর তখনই চার্চের দরজাতে শববাহী শকট মাঠের মসৃণ ঘাস পার হয়ে অন্য এক ইচ্ছার জগতে উঠে যাচ্ছে। ফুটপাথ ধরে অজস্র যাত্রী—গুনে শেষ করা যায় না, ফকিরচাঁদ অন্তত সময়ের প্রহরী হিসাবে গুনে শেষ করতে পারছে না। বাসস্ট্যান্ডে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পর্যন্ত কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করল, কারণ দীর্ঘ সময় এই অনাবৃষ্টি......ফলে এই নগরীর দূরতম প্রান্ত আর দূরের মাঠ ঘাট সবই ক্লিষ্ট সকলে জানালা খুলে বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফকিরচাঁদ একটু বৃষ্টিতে ভেজার জন্য পথে গিয়ে বসল। আজ অফিস পাড়ায় এই বৃষ্টি উৎসবের মতো। সকলে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য মাঠে এবং ফুলের ভেতর ছুটোছুটি করছিল। এবং পাগল যে শুধু হাঁকছিল, ‘দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর’, যে শুধু হাঁকছিল, কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়’—সে এখন কিছু না হেঁকে শান্ত নিরীহ বালকের মতো অথবা কোনো

কৈশোর জীবনের স্মৃতিকে স্মরণ করে আকাশে মেঘের খেলা দেখছিল। আর পাগলের পাখির পালক তখন লাঠি থেকে উড়ে গেল—পাগল পালকের জন্য ঝড়ের সঙ্গে ছুটছে।

পাগলিনি নিভৃতে ট্রামডিপোর বাইরে লোহার পাইপের ভিতর শুয়ে বৃষ্টির খেলা দেখছিল। সে নখে দাঁত খুটছে। পাগলকে ছুটতে দেখে খপ করে পাগলের পা চেপে ধরল, এবং বলল, ‘দ্যাখ কেমন বৃষ্টি আসছে।’

‘হায় আমার পাখি উড়ে গেল, বৃষ্টি দেখে পাখি উড়ে গেল...’ পাগল হাউহাউ করে কাঁদছে।

দীর্ঘদিনের উত্তাপ, অনাবৃষ্টি বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। পাগল বৃষ্টি দেখে পালকের কথা ভুলে গেছে। বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টির জল ওদের শরীরে মুখে পড়ল। বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছিল। সুমি ওর ক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে কোনো রকমে দৌড়ে ফকিরচাঁদের কাছে চলে এল। বৃষ্টির ফোঁটা হিরের কুচির মতো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। পথের যাত্রীরা যে যার মতো গাড়িবারান্দায়, বাসস্টপের শেডে এবং দোকানে দোকানে সাময়িক আশ্রয়ের জন্য ঢুকে গেল—ওরা সকলেই যেন প্রাচীন কাল থেকে কোনো বিস্তীর্ণ কবরভূমি হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত—ওরা সবুজ শস্যকণা এই বৃষ্টির জলে এখন ভাসতে দেখল।

পরদিন ভোরে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হরফে কলকাতায় বছরের প্রথম বর্ষণ’ এই শীর্ষকে প্রবন্ধ এবং ঠিক প্রথম পাতার উপরে বড়ো এক ছবি, আর

যুবতী নারী জলের ফোঁটা মুখে চন্দনের মতো মেখে নিচ্ছে। অথবা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ছবি, দুর্গের বুরুজে জালালি কবুতর উড়ছে।

বৃষ্টি সারারাত ধরে হয়েছে। কখনও টিপটিপ কখনও ঘোর বর্ষণ এবং জোরে হাওয়া বইছিল। ভোরের দিকে যখন কর্পোরেশনের গাড়ি গলা জলে নেমে ম্যানহোল খুলে দিচ্ছিল, যখন ট্রাম-বাস বন্ধ, যখন বৃষ্টির জন্য ছাতার পাখিরা কলকাতার মাঠ পার হয়ে গঙ্গার পাড়ে, অথবা হুগলি নদীর পাড়ে পাড়ে সব চটকলের বাবুরা বাগানে ফুলের চারা পুঁতে দিচ্ছিল তখন বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ কলকাতার বুক জল থেকে আকাশ দেখল। পাশে সুমি। সে পেটের নীচে হাত দিয়ে রেখেছে-ভয়, নীচে যে সন্তান জন্মলাভ করছে, ঠাণ্ডায় ওর কষ্ট না হয়।

পাতলা প্লাইউডের ঘর এখন জলের তলায়। মরা ইঁদুর ভেসে যাচ্ছিল জলে। জানালায় যুবক যুবতীরে মুখ-ওরা বৃষ্টির জলে হাত রেখে বড়ো বড়ো হাই তুলছিল। কিছু টানা-রিকশা চলছে, ট্রাম-রাস্তার উপরে যেখানে জল কম, যেখানে একটা মরা কুকুর পড়ে আছে, টানা-রিকশাগুলো সেই সব পথ ধরে প্রায় হিক্কা ভোলার মতো এগুচ্ছে। এই বর্ষায় পিচের পথ সব ভগ্নপ্রায়, মাঝে মাঝে ভয়ানক ক্ষতের মতো দাগ, সুতরাং রিকশা চলতে গিয়ে ভয়ংকর টাল খাচ্ছে। বর্ষার জলে পথ ভেসে গেছে বলে সুখী লোকেরা কাগজের সব নৌকা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। সুমি এবং বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ সারারাত জলে ভিজে ভিজে শীতে কাঁপছিল। অন্য ডাঙার সন্ধানে যাওয়ার জন্য ওরা জলে নেড়ি কুকুরের মতো সাঁতরাচ্ছিল। ওরা আর পারছে না। গভীর রাতে যখন বর্ষণ ঘন ছিল,

যখন কেউ জেগে নেই, যখন পথের সব আলো মৃত জোনাকির মতো আলো দিচ্ছে...সুমি অসীম সাহস বুকে নিয়ে ডাঙা জমির জন্য সর্বত্র বিচরণ করতে করতে সামনের চার্চ এবং রাজাবাজারের ডিপোতে অথবা জলের পাইপগুলো অতিক্রম করে অন্য কোথাও...সুমি পরিচিত সব স্থান খুঁজে এসেছে, ডাঙা জমির কোথাও একটু সে ছাদ খুঁজে পায়নি।

ওরা জল ভেঙে ওপারে এসে উঠতেই দেখল বৃষ্টি ধরে আসছে। আকাশের গুমোট অন্ধকারটা নেই এবং কিছু হালকা মেঘ দেখা যাচ্ছে। এ-সময়ে সেই পাগল পুরোপুরি নগ্ন। ভিজে জামাকাপড়। গায়ে রাখতে সাহস করছে না। সুমি পাঁচিলের সামনে শরীর আড়াল করে কাপড় চিপে নিল এবং ফকিরচাঁদের কাপড় চিপে দিল। ফকিরচাঁদ শীতে ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাগলিনি জলের পাইপের ভেতর শুয়ে থেকে শুকনো হাড় চুষে চুষে শীতের কষ্ট থেকে রেহাই পাচ্ছে। ওর সব বসনভূষণ পাইপের ভিতর যত্ন করে রাখা। কিছু কাগজ সংগ্রহ করে মুণ্ডমালার মতো কোমরের ধারে ধারণ করে যেন কত কষ্টে লজ্জা নিবারণ করছিল। আকাশে হালকা মেঘ দেখে এবং আর বৃষ্টি হবে না ভেবে ঠিক টাকি হাউসের সামনে বাঁ হাত কোমরে অথবা সামনে....তেরে কেটে ধিন এইসব বোলে পাগল হামেশাই নাচছে—কলকাতা বৃষ্টির জলে ডুবে গেল, আমার পাখি উড়ে গেল বাতাসে। পাগল এইসব গান গাইছিল।

সুমি পাগলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং একটু ঠেলে দিয়ে বলল, এই তুই ফের নেংটো হয়েছিস! তুই ভারি অসভ্য। বলে খিলখিল করে হেসে উঠল, ফকিরচাঁদ পাঁচিলের

গোড়ায় বসে রয়েছে। সে হাসতে পারছে না। থেকে থেকে কাশি উঠছে এবং চোখ ক্রমশ ঘোলা দেখাচ্ছিল। আকাশের মেঘ হালকা, হয়তো আর বৃষ্টি হবে না। ফের ট্রাম বাস চলতে শুরু করবে অথবা এইসব সারি সারি ট্রাম বাস উটের মতো মুখ তুলে 'দীর্ঘ উ টি আছে ঝুলে' বলে সারাদিন মুখ থুবড়ে থেমে থাকবে। ফকিরচাঁদ শীত তাড়াবার জন্য কাতরভাবে শৈশবের 'অ'য় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে, ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে—যা বৃষ্টি শালা কোনো ইঁদুরের ছানাকে আর বেঁচে থাকতে হচ্ছে না। সে দেয়ালে এসময় কী লেখার চেষ্টা করল কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতা ঘন বলে কোনো লেখা ফুটে উঠল না।

ফকিরচাঁদ রোদের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফুটপাথ থেকে জল নেমে যাচ্ছে। ট্রাম বাস ফের চলতে শুরু করেছে এবং দুপুরের দিকে আকাশ যথার্থই পরিষ্কার—মনে হচ্ছে বৃষ্টি আর হবে না, যেন শরৎকালীন হাওয়া দিচ্ছে। বৃদ্ধ এ সময় সুমিকে পাশে নিয়ে বসল। রোদ উঠবে ভেবে সে সুমিকে জীবনের কিছু সুখদুঃখের গল্প শোনাল। ভিজে কাপড় শরীরে থেকে থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার জল কমে গেছে-বৃদ্ধ এবার উঠে দাঁড়াল এবং এক মগ চা এনে পরস্পর ভাগ করে খেল। বৃষ্টি আর আসছে না, বৃদ্ধ অনেকদিন আগের কোনো গ্রাম্য সঙ্গীত মিনমিনে গলায় গাইছে। তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির ভিতর থেকে একটা ভাঙা এনামেলের থালা বের করে রেস্তোরাঁ অথবা কোনো হোটেলের উদবৃত্ত এবং উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য বের হয়ে গেল। জীবনটা এভাবেই কেটে যাচ্ছে-জীবনটা রাজবাড়ির সদরে ঝুলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির মতো—মাথা সবসময় উঁচিয়েই আছে।

কিন্তু কীসে কী হল বলা গেল না। সমাজের সব ধূর্ত শেয়ালদের মতো আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। ফের বৃষ্টি-বর্ষাকাল এসে গেল। বৃষ্টি ঘন নয় অথচ অবিরাম। ফকিরচাঁদের বসবাসের স্থানটুকু ভিজে গেছে। পাগল-পাগলিনিকে আর এ-অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে না। ফকিরচাঁদ উচ্ছিষ্ট অন্ন খেতে খেতে হাঁ করে থাকল— কারণ আকাশের অবস্থা নিদারুণ, আজ সারাদিন বৃষ্টি হবে...উত্তাপের জন্য ওর ফের কান্না পাচ্ছিল।

সুমি পাঁচিলের পাশে ফকিরচাঁদকে টেনে তুলল। এই শেষ শুকনো ডাঙা। ওর ভিতরে ভিতরে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। তলপেট কুঁকড়ে যাচ্ছে এবং ভেঙে যাচ্ছে। সুমি নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেল এবং যে-কোনোভাবে ফকিরচাঁদের শরীরে উত্তাপ সঞ্চয় হোক এই চাইল। ফকিরচাঁদ শীতের কথা ভেবে মড়া কান্নায় ভেঙে পড়ছে। ফকিরচাঁদ খেতে পারছে না—কত দীর্ঘদিন থেকে যেন বৃষ্টি আর থামবে না—শীতে শীতে বছর কেটে যাবে। ফকিরচাঁদ বলল, সুমি আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চল।

কোথায় যাব রে! আমার শরীর দিচ্ছে না রে! তেরো বছরের সুমি তলপেটের দু-পাশে দু-হাত রেখে কথাগুলো বলল।

ফকিরচাঁদ পুনরাবৃত্তি করল, আমাকে কোথাও নিয়ে চল রে সুমি।

সুমি এনামেলের থালা থেকে বাসি রুটি এবং ডাল খাচ্ছিল। ভিজে জবজবে কাপড়। ভিতর থেকে ওর-ও শীত উপরে উঠে আসছে। এবং মনে হচ্ছে জরায়ুর ভিতর যেন কেউ গাঁইতি মেরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। সুমি নিজের এই কষ্টের জন্য রুটি মুখে দিতে পারছে না এখন এবং ফকিরচাঁদের কথার জবাব দিতে পারছে না।

বাস ট্রাম যাবার সময় কাদা জল উঠে আসছে ফুটপাথে। ফুটপাথ কর্দমময়। ফকিরচাঁদের এখন উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত শক্তি নেই। সে ক্রমশ স্থবির হয়ে পড়ছে। এখন সর্বত্র যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং কাকগুলো বিজলির তারে বসে বসে ভিজছে। থেকে থেকে ট্রাম বাস চলছে এবং ছাতা মাথায় যারা যাচ্ছিল তারা ছাতার জলে আরও ভয়াবহ করে তুলছে ফুটপাথ—সুতরাং ফকিরচাঁদ কিছু বলতে পারছে না, ফকিরচাঁদ বৃদ্ধ, সুন্দর হস্তাক্ষর ছিল হাতের, পণ্ডিত ছিল ফকিরচাঁদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, তারপর ফকিরচাঁদ পত্র এবং পরিবারের সকলকে হারিয়ে দীর্ঘসূত্রতার জন্য ফুটপাথের ফকিরচাঁদ হয়ে গেল। ফকিরচাঁদের সংগ্রহ করা শতচ্ছিন্ন গেঞ্জি এবং আবরণ এখন কর্দময়। সে শীতে ফের কাঁপতে থাকল এবং ফের কথা বলতে গিয়ে দেখল দাঁতমুখ শক্ত, শরীর শক্ত এবং অসমর্থ। সে যেন কোনোরকমে নিজের হাতটা সুমির দিকে বাড়িয়ে ধরল।

এখন দিন নিঃশেষের দিকে। সুমি একটু শুকনো আশ্রয়ের জন্য গোমাংসের দোকান অতিক্রম করে রাজাবাজারের পুল পর্যন্ত হেঁটে গেছে। সর্বত্র মানুষের ভিড় এবং এতটুকু আশ্রয় সুমির জন্য কোথাও পড়ে নেই। সকল ফুটপাথবাসী অথবা বাসিনীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। সকলেই মাথার উপর ভাঙা ছাদ পেলে খুশি আর সর্বত্র ওলাওঠার

মতো মড়কের শামিল পথঘাট। সুতরাং সুমি ফিরে এসে হতাশায় ফকিরচাঁদকে কিছু বলতে পারল না। সে ফকিরচাঁদের পাশে চুপচাপ বসে পড়ল। ঠাণ্ডা লাগার জন্য শীতে এখন সে কাঁপছে।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাঁট সর্বত্রগামী। বৃদ্ধের চুল দাড়ি ভিজে গেছে। রাস্তার আলো বৃদ্ধ ফকিরচাঁদের মুখে, দাড়িতে বিন্দু বিন্দু জল মুক্তোর অক্ষরের মতো—যেন লেখা, আমার নাম ফকিরচাঁদ শর্মা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, নিবাস যশোহর- ফকিরচাঁদ উদাস চোখে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে এসব ভাবছিল। চোখ ঘোলা ঘোলা ওর, সুমি এই বৃষ্টিতে বসেই এনামেলের থালা থেকে ঠাণ্ডা অড়হরের ডাল এবং রুটি ফকিরচাঁদের মুখে দিতে গেল। সে মুখে খাবার তুলতে পারছে না। ঠাণ্ডায় মুখ শক্ত। সে শুধু উত্তাপের জন্য হাত দুটো সুমির হাঁটুর নীচে মসৃণ ত্বকের ভিতর গুঁজে দিতে চাইল।

সুমি বলল, ‘দাদু তুই ইতর হয়েছিস?’ বলে হাতটা তুলে দিতেই দেখল, ফকিরচাঁদের চোখ যেন ঘোলা ঘোলা-ফকিরচাঁদ যেন মরে যাচ্ছে।

সে চিৎকার করে উঠল ‘দাদু! দাদু! ফকিরচাঁদ ঈষৎ চোখ মেলে ফের চোখ বুজতে চাইল। সুমি তাড়াতাড়ি একটু আশ্রয়ের জন্য হোক অথবা ভীতির জন্য তোক উঠে পড়ল। বৃষ্টি মাথায় একটু আশ্রয়ের জন্য দোকানে দোকানে এবং ফুটপাতের সর্বত্র এমনকী গলিঘুজির সন্ধানে সে ছুটে ছুটে বেড়াল। বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে। ফুটপাথে ফের জল উঠতে আরম্ভ করেছে। আর অধিক রাতে সুমি যখন ফিরল, যখন ফের তলপেটে

ঈশ্বর কামড়ে ধরছে, শরীরটা নুয়ে পড়ছিল, জলের জন্য ভিতরে ভিতরে ঈশ্বর মোচড় দিচ্ছে এবং ট্রাম বাস চলছে না, ইতস্তত দূরে দূরে কিছু ট্যাক্সি কচ্ছপের মতো ভেসে আছে এবং হোটেল রেস্তরাঁর দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেউ বৃষ্টিতে ভিজে জেগে থাকবার জন্য বসে নেই—সুমির তখন ক্লিষ্ট চেহারা বড়ো করুণ দেখাচ্ছিল। সামনে অপরিচিত অন্ধকার, চার্চের সামনে হেমলক গাছ লোহার রেলিং টপকে গেলে ছোটো ঘর এবং সেখানে কাঠের কফিন মাচানের মতো করে রাখা। হেমলক গাছের বড়ো বড়ো পাতার ভিতর জলের শব্দ আর সামনে সব কবরভূমি—চার্চের ভিতর কোনো আলো জ্বলছে না...সুমি নিঃশব্দে লোহার রেলিং টপকে কফিনের ভিতর শুয়ে সন্তান প্রসবের কথা ভাবতেই ফকিরচাঁদের কথা মনে হল—আবার এই পথ এবং জলের শব্দ, সুমি ফুটপাথের জল ভেঙে ফকিরচাঁদকে আনার জন্য ধীরে ধীরে রাজবাড়ির সদর দরজার ঝোলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির নীচে দাঁড়াল। ওর অদ্ভুত এক কান্না উঠে আসছে ভিতর থেকে। জন্মের পর এই বৃদ্ধকে সে দেখেছে আর সেই মোষের মতো পুরুষটা যাকে সে তার ভালোবাসা দিতে চেয়েছিল, যে চুন গোলা জল ফেলে ঘুঘু পাখিদের উড়িয়ে দিয়েছে.....সদর দরজায় এক হাত গণ্ডারের ছবির নীচে দাঁড়িয়ে সুমি কাঁদতে থাকল। বৃষ্টির ঘন ফোঁটা, গাছগাছালির অস্পষ্ট ছায়া অথবা সাপ বাঘের ডাকের মতো ব্যাঙের ডাক আর নগরীর দুর্ভেদ্য স্বার্থপরতা সুমির দুঃখকে অসহনীয় করে তুলছে। সুমির শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমনকী পাগলেরাও এই বৃষ্টিতে বের হচ্ছে না, পুলিশ কোথাও পাহারায় নেই। সুমি এত বড়ো শহরের ভিতর এখন একা এবং একমাত্র সন্তান যে মুখ বের করবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তখনই সুমি দেখতে

পাচ্ছে পাগল জলের ভিতর হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে 'দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর'। পিছনে পাগলিনি। আজ এই রাতে দুজনের হাতেই লাঠি। লাঠির মাথায় পাখির পালক উড়ছে।

সুমি ফকিরচাঁদের হাত ধরে কফিনের ভিতর ঢুকে প্রসব করার জন্য কাঠের দোকানগুলো অতিক্রম করে গেল। ফকিরচাঁদ দেখল ওদের কাপড়জামা জলে ভিজে সপসপ করছে। শীত সেজন্য ভয়ংকর। ওরা দুজনে প্রথম জামাকাপড় ছেড়ে ফেলল— এখন ফকিরচাঁদই সব করছে। সুমি অতীব দুঃখে এবং বেদনায় একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। ওদের শরীরে কোনো আবরণ ছিল না। মাচানের নীচে সুমি ঢুকে যেতে চাইল। কিন্তু কফিনের ভিতরে কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কে! কে!' ফকিরচাঁদ চিৎকার করে যুবকের মতো রুখে দাঁড়াল।

কফিনের ডালা খুলে মুখ বের করতেই বুঝল সেই পাগল, পাগলিনি। ওরা আশ্রয়ের জন্য এখানে এসে উঠেছে।

ফকিরচাঁদ বলল, তোরা সকলে মিলে সুমিকে ধর। সুমির বাচ্চা হবে।

ফকিরচাঁদ এবং পাগল হেমলক গাছটার নীচে বসে থাকল। পাগলিনি মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে সুমিকে কোলে তুলে চুমু খেল একটা। তারপর কফিনের ভিতর সন্তানের জন্ম হলে পাগলিনি গ্রাম্য প্রথায় তিনবার উলু দিল। সেই শব্দের ঝংকারে মনে হচ্ছিল সমুদ্র কোথাও না কোথাও আপন পথে অগ্রসর হচ্ছে, মনে হচ্ছিল— এই সংসার হাতির অথবা

গণ্ডারের ছবির ভিতর কখনো-কখনো লুকিয়ে থাকে। শুধু কোনো সৎ যুবকের সংগ্রাম প্রয়োজন। পাগল হেমলক গাছের নীচে শেষবারের মতো চিৎকার করে উঠল—'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়। ফকিরচাঁদ ধূসর অন্ধকারের ভিতর সুন্দর হস্তাক্ষরে শিশুর নতুন নামকরণ করে অদৃশ্য এক জগতের উদ্দেশে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

[দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর' এবং 'সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়' কবি বিমল চক্রবর্তীর কবিতা থেকে সংগৃহীত